সৈয়দ শামসুল হকের রম্যরচনা : সামান্য কথার অসামান্য প্রকাশ

স্বরোচিষ সরকার

১

শব্দ নিয়ে সরস আলোচনা বাংলা ভাষায় খুব কম। বিশ শতকের আশির দশকের সূচনায় কুন্তকের 'শব্দ নিয়ে খেলা', নব্বই দশকের সূচনায় ফরহাদ খানের 'শব্দের চালচিত্র', (১৯৯২), নিকটবর্তী সময়ে যতীন সরকারের 'গল্পে গল্পে ব্যাকরণ' (১৯৯৪) একুশ শতকের সূচনায় জ্যোতিভূষণ চাকীর 'বাগর্থকৌতুকী' (২০০২) এ ধরনের কয়েকটি বই। প্রথম বইটিতে কুন্তক ছদ্মনামে কবি শঙ্খ ঘোষ কিছু শব্দের গঠনকে গল্পের আকারে বোঝাতে চেষ্টা করেন। অনেকটা গল্পচ্ছলে ব্যাকরণ শেখানোর মতো। কাছাকাছি কৌশলে লেখা যতীন সরকারের বইটি। ফরহাদ খানের বইটি প্রধানত শব্দের উৎস সন্ধান বিষয়ক। শব্দের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অনেক মজার মজার তথ্য তিনি হাজির করেন। জ্যোতিভূষণ চাকীর বইটি কৌতুকপ্রধান, শব্দের প্রসঙ্গে মানুষকে কতোভাবে হাসানো যায়, তার চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেননি। এই বইগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর প্রধান লক্ষ্য পাঠকের ভুল সংশোধন এবং হাস্যরস সেখানে সংশোধন প্রক্রিয়ার একটি উপায়। সুরসিক শিক্ষক যেমন করে অল্প-মনোযোগী ছাত্রের ভাষা সংশোধনের পদ্ধতি বের করেন, অনেকটা সে-রকম। অন্যদিকে সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে সম্প্রতি প্রকাশিত সৈয়দ শামসুল হকের শব্দকেন্দ্রিক রম্যরচনার সংকলন 'কথা সামান্যই' (২০০৬) গ্রন্থের মূল লক্ষ্য পাঠকের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করা, শিক্ষকতা নয়। আড্ডার আসরে জানা বিষয় নিয়েও যেমন আনন্দঘন সময় কাটানো যায়, সৈয়দ হকের এ বইয়ের লেখাগুলোর প্রকৃতি তেমন। তাই এ গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধ শব্দ নিয়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা শব্দে সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রসঙ্গ বদলে যায়, যেমনটা আড্ডার মেজাজের সঙ্গে মানানসই।

শব্দকে উপলক্ষ করে লেখা হলেও সৈয়দ হকের এই রচনাগুলো যে প্রধানত রম্যরচনা, তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। বাংলাদেশে রম্যপ্রবন্ধের সংখ্যাও খুব একটা বেশি নয়। সৈয়দ হক তাঁর ভূমিকা প্রবন্ধটিতে সৈয়দ মুজতবা আলী, ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, মাহবুব জামাল জাহেদী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ কয়েকজন রম্যলেখকের নামোল্লেখ করেছেন। শুধু বাংলাদেশি রম্যলেখকদের কথা বিবেচনায় রাখলে এই তালিকায় আবুল মনসুর আহমদ, আসহাব উদ্দীন আহমদ, শওকত ওসমান, সানাউল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, মমতাজ উদদীন আহমদ, খোন্দকার আলী আশরাফ, আবদুশ শাকুর, আতাউর রহমান, হিলাল ফয়েজী, ফরহাদ খান, রণজিৎ বিশ্বাস, আনিসুল হক প্রমুখের নামও যুক্ত করা যায়। হুমায়ূন আহমেদের মতো কথাশিল্পী, অথবা গোলাম মুরশিদের মতো গবেষকও কখনো কখনো এ জাতীয় রচনায় হাত দেন। এঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হলে নিশ্চয়ই এ তালিকা আরো অনেক দীর্ঘ হবে। তবে তালিকা যতোই দীর্ঘ হোক না কেন এই জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা গত একশো বছরে একশো ছাড়িয়ে যায় না। এমন স্বল্পালোকিত সাহিত্যশাখায় সৈয়দ হকের এই দীর্ঘায়তন গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

২

ভূমিকা বাদে মোট ৯৫টি প্রবন্ধ রয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'কথা সামান্যই' প্রবন্ধ সংকলনে। একসঙ্গে এতোগুলো প্রবন্ধ নিয়ে গ্রন্থ সংকলিত হতে প্রায়ই দেখা যায় না। প্রবন্ধগুলোর শৈলী ও গঠনকাঠামো রম্যরচনার। তবে আলোচনার গতি প্রায় ক্ষেত্রেই শব্দার্থতত্ত্বমুখী হওয়ায় পুরো বই জুড়ে মননশীল একটা আবহ বইয়ের প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এভাবে রম্যরচনার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করেও প্রবন্ধগুলো মননশীল প্রবন্ধের সারিতে গিয়ে দাঁড়ায়। লেখক নিজেও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। বইয়ের ভূমিকায় তাই তিনি জানান : বিষয়বস্তুগৌরব আর রচনারস—দুইয়ের মিশ্রণ দিয়ে তিনি এগুলো তৈরি করেছেন।

প্রবন্ধগুলোর অভিনব একটি প্রকরণ-লক্ষণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে; তা হলো: গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য চার পৃষ্ঠা। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বইয়ের কোথাও উল্লেখ করা না হলেও, এ বইয়ের অধিকাংশ লেখা প্রথমে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার বৃহস্পতিবারের সাহিত্য সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কয়েক যুগ ধরে পত্রিকাটির সাহিত্যপাতার বেশ সুনাম। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই পাতায় স্পেসজনিত বিশেষ কোনো সংকট রয়েছে। তাছাড়া লেখক যদি হন সৈয়দ শামসুল হকের মতো খ্যাতনামা কেউ, তাহলে তার কাছ থেকে যতোটা বেশি লেখা আদায় করা যায়, সাহিত্যপাতার সম্পাদক বরং তার চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। তাই মনে হয়, প্রবন্ধগুলোর এমন চারপৃষ্ঠার হওয়ার পেছনে আর যে কারণই থাক না কেন, অন্তত কলামের সাইজ বা পত্রিকার পরিসরগত সীমাবদ্ধতা দায়ী ছিলো না। প্রবন্ধগুলোর আকার এমন হওয়ার জন্য মনে হয় লেখকই দায়ী। সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন, লেখক এমনটা করলেন কেন? লেখক কি 'চতুষ্পত্রী' নামে রম্যপ্রবন্ধ বা রসরচনার নতুন কোনো শাখা খুলতে চান? কবিতায় যেমন রয়েছে সনেট বা রুবাই? নাকি প্রবন্ধগুলোর মধ্যে এটা নিছকই একটা মিল, যা একেবারেই অপূর্বভাবিত? এ ব্যাপারে একটা অনুমান অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। সকলেই জানেন সৈয়দ হক তাঁর যাবতীয় রচনা কম্পিউটারে লেখেন। কম্পিউটারে লেখার সময়ে মোট রচনার ক্যারাকটার, শব্দ, লাইন, পৃষ্ঠা সকলই দেখা যায়। এই যান্ত্রিকতা লেখককে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। তবে যে কারণেই হোক না কেন, চার পৃষ্ঠার মধ্যে এই 'থামতে পারার' গুণ লেখাগুলোকে নতুন একটা মাত্রা দান করে। যে পরিমিতিবোধের অভাব যাবতীয় বাংলা রচনার একটি বিরক্তিকর বৈশিষ্ট্য, তার বিপরীতে সৈয়দ হকের এই নির্দিষ্ট পরিসরের চতুষ্পত্রীগুলো নতুন ধারা সৃষ্টি করে। জায়গা ছোটো হওয়ার জন্য আবেগ সংহত হয়, লেখার মধ্যে পুনরুক্তি থাকে না, এক ধরনের লেখা অনেকক্ষণ ধরে পড়ার ফলে যে একঘেয়েমি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা থেকেও পাঠককে মুক্ত রাখা যায়, আবার নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে বলার বাসনা থাকার জন্য ভাষাগত সৌন্দর্যের

দিকেও নজর রাখা সম্ভব হয়। এভাবে সৈয়দ হকের আলোচ্য চতুষ্পত্রীগুলো রম্যরচনার জগতে এক অভূতপূর্ব উদাহরণ তৈরি করে।

সৈয়দ হক তাঁর গ্রন্থের সূচনায় "সবিনয় নিবেদন" নামে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ যে ভূমিকাটি রচনা করেছেন, এই বইয়ের প্রকৃতি বোঝার জন্য সেটা বিশেষ মূল্যবান। সেখানে তিনি সংকলিত প্রবন্ধগুলোকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন, বাংলাদেশে এই শ্রেণির রচনার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, রচনাগুলোর কাঠামো, বিষয় ও উপস্থাপনশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। কিভাবে এই জাতীয় রচনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন, তা বর্ণনা করেছেন। ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে, ভাষার অন্যতম উপাদান শব্দ সম্পর্কে, শব্দের উৎস সম্পর্কে তাঁর যে অনেক কথা বলার আছে, ভূমিকার মধ্যে সৈয়দ হক তাঁর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গত দাবি করেন, শব্দবিষয়ক নীরস আলোচনাকে সরস আলোচনায় পরিণত করা রচনাগুলোর অন্যতম লক্ষ্য। ভূমিকা-প্রবন্ধে বর্ণিত এই দাবিকে খানিকটা অহঙ্কারপ্রসূত মনে হলেও, তা যে অতিশয়োক্তি নয়, প্রবন্ধগুলো পাঠ করার পরে তা বোঝা যায়। অত্যন্ত সরসভাবে বর্ণনা করা বাংলা শব্দভাÊার সম্পর্কে সৈয়দ হকের ধারণা কতো গভীর ও পাÊিত্যপূর্ণ প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যেই তার ছাপ রয়েছে। যাঁরা অ্যাকাডেমিক আলোচনা করে থাকেন, সৈয়দ হকের ভাষায় যাঁরা কেজো সম্প্রদায়ের লোক, তাঁদের চমকে দেওয়ার মতো তথ্যও তিনি অত্যন্ত অবলীলায় বর্ণনা করে যান। এক জায়গায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য তিনিও তথাকথিত কেজো সম্প্রদায়েরই একজন। বইটি উৎসর্গও করা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু "অভিধানে আমোদ" প্রবন্ধ রচনা করে সৈয়দ হককে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে পারলেও, তাঁর রচনাবলিও এক অর্থে 'পুষ্পতৃণশূন্য'।

রম্যপ্রবন্ধ, রসরচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ—যে নামেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, এই জাতীয় প্রবন্ধের গঠনশৈলী বিচিত্র। কিন্তু সাহিত্যের প্রতিটি শাখারই বিশেষ কিছু প্রকরণ থাকে, থাকে এমন কিছু গঠনশৈলী, যা না থাকলে ঐ শ্রেণীর সাহিত্যকে নির্দিষ্ট শাখায় বিন্যস্ত করা যায় না। রম্যরচনাকেও এভাবে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব। কিন্তু কী সেই বৈশিষ্ট্য? সে কি কোনো নিয়ম না মানার বৈশিষ্ট্য? নাকি অন্য কিছু? আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, এ ধরনের রচনায় সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব প্রমাণের চেষ্টা নেই, ভাষাপ্রয়োগ প্রায় ক্ষেত্রেই কাব্যিক, প্রধান রস হাস্যরস—কৌতুক, বিদ্রুপ, শ্লেষ, ব্যঙ্গ ইত্যাকার যাবতীয় কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হাসি সৃষ্টির চেষ্টা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই থাকে, এমনকি অনেক সময়ে নামকরণের সঙ্গেও লেখার পাঠের মিল থাকে না; সর্বত্রই লক্ষ করা যায়, এক ধরনের আড্ডার মেজাজ; একই কারণে আলোচনার মধ্যকার কোন কথাটা যে কিভাবে মুখ্য কথায় পরিণত হয়ে যায়, সে ব্যাপারেও লেখকেরও কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে, এমন মনে হয় না। এই সংজ্ঞায় সৈয়দ হকের এই গ্রন্থের যাবতীয় প্রবন্ধ এমনকি ভূমিকা-প্রবন্ধটিকেও রম্যপ্রবন্ধ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য।

সৈয়দ হক তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাবকে প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান না। যেমন 'সুপারি' প্রবন্ধে তিনি সুপারি শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে বিশেষ অভিমত ব্যক্ত করেন, এই শব্দের প্রয়োগ সন্ধান করেন মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যখন তাঁর মায়ের সুপারি খাওয়ার প্রসঙ্গ এবং নিজের ঘরের পেছনের সুপারি গাছের বৃদ্ধি দেখে মায়ের স্মৃতিকে হাতড়ে ফেরেন, তখন শব্দ "সুপারি" এবং তার ব্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গ একেবারেই গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে এমন একটি বাক্য, যেখানে সৈয়দ হক বলেন, 'সুপারি পেড়ে এখন আমি বুয়াদের বিলিয়ে দিই। আমার মাও তো সারাজীবন বুয়ার মতোই খেটে গেছেন সংসারে।' এইভাবে সৈয়দ হকের শব্দ বিষয়ক আলোচনাও এক নিঃশব্দ আবেগমোক্ষণে সমাপ্তি লাভ করে। গ্রন্থটির প্রায় অধিকাংশ শব্দ বিষয়ক রচনাই এভাবে শব্দহীন প্রসঙ্গের মধ্যে লীন হয়ে যায়। অথবা ধরা যাক, "ঢেঁকি" প্রবন্ধটি। একই নামে বঙ্কিমচন্দ্রেরও একটি রম্যরচনা রয়েছে। বঙ্কিম সেখানে ঢেঁকির কর্মতৎপরতা বর্ণনায় সুন্দরী মেয়ের পদাঘাত বর্ণনার পাশাপাশি এক পর্যায়ে বাংলাদেশের তাবৎ পুরুষগুলোকে ঢেঁকির সঙ্গে তুলনা করে বিদ্রুপ করেছিলেন। সৈয়দ হকের "ঢেঁকি"-তেও ঢেঁকি সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্য প্রদানের পাশাপাশি শেষ দিকে এসে যখন বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলে যাবার মতো করে বাঙালিরা যে ঢেঁকি সংক্রান্ত যাবতীয় পরিভাষা-প্রবাদই কেবল ভুলে যাচ্ছে তাই নয়, আশানন্দ ঢেঁকির মতো ব্যক্তিকেও ভুলে যাচ্ছে, যিনি আস্ত একটা ঢেঁকি তুলে একাই অশুভ শক্তির মোকাবেলায় এগিয়ে এসেছিলেন। সৈয়দ হকের নিকট ঢেঁকি এভাবে প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত হয়ে যায়, শব্দের উৎস বা শব্দার্থবিষয় সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে।

সৈয়দ হকের ভাষা সবসময়েই কাব্যিক। তিনি যখন উপন্যাস লেখেন, গল্প লেখেন, নাটক লেখেন, কবিতা লেখেন—সব সময়েই কাব্য তাঁর প্রধান অস্ত্র। সাহিত্য সংগ্রামে কাব্যরূপ অস্ত্রই তাঁকে সবখানে জিতিয়ে দেয়। অলঙ্কার শাস্ত্র অথবা সৌন্দর্যতত্ত্ব বর্ণিত এমন কোনো কৌশল নেই সৈয়দ হকের কাব্যে যার সফল প্রয়োগ ঘটে না। আলোচ্য গদ্যরচনাগুলোর মধ্য থেকেও প্রায় সব ধরনের কাব্যপ্রয়োগের উদাহরণ উদ্ধৃত করা সম্ভব।

শব্দ বিষয়ক রম্যরচনায় শ্লেষ জাতীয় হাস্যরস মুখ্য হয়ে ওঠার কথা, অন্তত তেমনটা মনে হতে পারে। তুলনাটা ভিন্ন ধরনের হলেও যেমনটা লক্ষ করা গিয়েছিলো সুকুমার রায়ের কাব্যে। কিন্তু সৈয়দ হকের প্রবন্ধগুলোতে তা নেই। বরং নানা কারণে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-কৌতুকই অন্য সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। সেই সঙ্গে কোনো কোনো রচনায় হিউমার বা বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রয়োগ ঘটে। অনেক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এমনকি দিকনির্দেশক বহু তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা উপস্থাপিত হলেও এই জাতীয় প্রবন্ধের পাঠক কিন্তু হাস্যরসটার জন্যই অপেক্ষা করে থাকেন। সৈয়দ হক তা জানেন, তাই অনেক জরুরি বিষয়ও তিনি হাস্যরসের মোড়কে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। শব্দের ভুল প্রয়োগ নিয়ে, দেশের নীতিনির্ধারকদের অযোগ্যতা নিয়ে, অসাধুতা নিয়ে, দুর্নীতি নিয়ে, মিথ্যাচার নিয়ে, ইতিহাস-বিকৃতি নিয়ে বলা কথাগুলো সাধারণত কাঠখোট্টা প্রকৃতির হয়। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে সৈয়দ হক যখন কথা বলেন, তখন তা মোটেই কাঠখোট্টা হয় না। এসব কথা কিভাবে মিছরির ছুরির মতো যুগপৎ মিষ্টি আর ধারালো হয়ে ওঠে, দু-একটি উদাহরণের দিকে চোখ রাখলেই তা বোঝা যাবে। 'খুঁটি' প্রবন্ধে তিনি লেখেন:

"দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানে সুরতাল সহযোগে মন্দ্রস্বরে যতই বলুন মানুষ আমরা নহি তো মেষ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মেষের মতোই খুঁটিগাড়ি দিয়েছেন, আমরাও মাস্তানদের চাঁদা দিচ্ছি।" (পৃ. ৩৮) এখানে মূল ইঙ্গিতটা সমকালীন রাজনীতিতে ক্ষমতাবান চাঁদাবাজদের প্রতি এবং বিদ্রূপটা সাধারণ মানুষের অক্ষমতার প্রতি। বাঙালির কর্মবিমুখতাকে সমালোচনা করতে গিয়ে "কাজ" প্রবন্ধের শেষে লেখেন: "কাজ না করার অবস্থাটা যে কত সৌভাগ্যের সে আমাদের মুরুব্বিরা জানেন। তাই তাঁরা দোয়া করেন, সাত পুরুষ যেন বসে খেতে পারো!" (পৃ. ৬৪)। "ছেঁদো" প্রবন্ধে রাষ্ট্রধর্ম এবং সব নাগরিকের সমান অধিকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন:"ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হলো, সংবিধানের খতনা করানো গেল, তারপরও মুসলিম আর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এক স্তরের নাগরিক।" (পৃ. ৬৫) উল্লেখ করা যাক "খাওয়া" প্রবন্ধের উপসংহার-বাক্য: "সুখী সে, যে আইনকে কলা দেখিয়ে, পুলিশকে পকেটে পুরে, বিচার ব্যবস্থাকে নুলো করে দিয়ে, সারাদিনের লুটপাটের পর নিজের প্রাসাদে ফিরে, এসির হাওয়ায় গা ঠাÊা করে, হুইস্কিতে গলা ভিজিয়ে ডিনারে বসে।" (পৃ. ৮০) সৈয়দ হকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এমন উদাহরণ প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যেই কমবেশি খুঁজে পাওয়া যায়।

৩

প্রবন্ধগুলোতে উত্থাপিত প্রায় সব বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত পোষণ না করার কোনো কারণ নেই। কেননা বিষয়গুলোকে তিনি বিশ্বস্ত তথ্য ও প্রমাণসহ উপস্থাপন করেন। তবে পাঠক এর সবগুলোর সঙ্গে সর্বাংশে একমত হবেন বা এ বিষয়ে সব কথা বলা হয়ে গেছে বলে ভাববেন, তা হয়তো নয়; লেখকও নিশ্চয়ই তেমন প্রত্যাশা করেন না। অভিন্ন কারণে বর্তমান আলোচকের মনেও কিছু ভিন্নমত ও মতামত রয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে দু-একটির উল্লেখ করা যাক। যেমন সুপারি শব্দটি সুর্পারক বন্দরের নাম থেকে হতে পারে, যদিও লেখকের ধারণা শব্দটি সফর থেকে আসা সম্ভব। (পৃ. ৪৪) "কাজ" প্রবন্ধে লেখক ভেরেন্ডার তেলের সুপরিচিত ইংরেজি নাম কাস্টর অয়েলের উল্লেখ করতে পারতেন। (পৃ. ৬২) হ্রস্ব ই দিয়ে শেষ হয়েছে, এমন বিশেষণ খুঁজে পাওয়া যায় না বলে লেখক দাবি করেন, বলেন, "বাংলা ভাষায় একটিও বিশেষণ পদ খুঁজে পাই না যেটির শেষে আছে স্বরবর্ণ ই।" (পৃ. ১১৫) বোঝা মুশকিল সৈয়দ হক কেন এমনভাবে ঢালাও একটি মন্তব্য করলেন, নাকি মুদ্রণজনিত কোনো ত্রুটির কারণে এমনটা হলো? চোরাই মাল, চেরাই কাঠ, চোলাই মদ প্রভৃতি বাক্যাংশের প্রথম অংশ তো বিশেষণই। "ডাক" প্রবন্ধে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের একটি বিখ্যাত উক্তি "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর"—যা আয়েশা করেছিলো, লেখক হয়তো অনবধানতাবশত 'রাজসিংহ' উপন্যাসের বরাত দিয়েছেন। (পৃ. ১৪৯) "ভাষা ব্যবহার" প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের কাব্যের বরাতে পাটনিকে দিয়ে ঈশ্বরের দেখা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কাব্যে রয়েছে চÊীর দেখা। আরাধ্য অর্থে হয়তো কথাটা প্রায় সত্য, তবে পুরো সত্য নয়। এছাড়া কয়েকটি শব্দের বানান নিয়ে লেখকের সঙ্গে দ্বিমত করা চলে, যেমন—'দেওয়া', 'ভারী', 'বাদী-বিবাদী' 'গোষ্ঠী', 'চাষি' ইত্যাদি।

শব্দের অর্থ পরিবর্তন একটি নিয়ত প্রক্রিয়া। এই কথা স্বীকার করার অর্থ হলো, কোনো অভিধানই পুরোপুরিভাবে হালতক নয়, বা কোনো অভিধানই শব্দার্থ পরিবর্তনকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। বাস্তবে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটার অনেক পরেই অভিধানে তা স্থান পায়। তাই অভিধানের বরাত দিয়ে সৈয়দ হক যখন লেখকদের 'দ্রোহ' শব্দ ব্যবহারে ভুল ধরেন, তখন তা মেনে নিতে কষ্ট হয়। তিনি বলেন—"তবে সামান্য ভুলে অসামান্য মূর্খতার একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ...বক্তৃতায় বলা হয়, সমালোচনায় লেখা হয় *দ্রোহ*—প্রশংসারই অর্থে। সামান্য একটা অভিধান উলটে দেখার মতো সামান্য একটু পরিশ্রমও বোধহয় এঁরা করতে রাজি নন।" (পৃ. ২০) বইয়ের শেষ দিকের একটি প্রবন্ধে ("শব্দগতি") সৈয়দ হক অবশ্য শব্দটি ব্যবহার বিষয়ক এই অবস্থান থেকে সরে আসেন। অভিন্ন শব্দের অর্থান্তরকে স্বীকার করে নিয়ে বলেন, "শব্দের অর্থ স্থির থাকে না, বিশেষ কালে বিশেষ বাস্তবতার কারণে শব্দগতি বদলে যায়। হালের আরো একটি শব্দের কথা বলি : রাষ্ট্রদ্রোহিতা। শব্দটা বাংলাদেশে এখন মনে হয় নতুন একটা অর্থের দিকে মোড় নিয়েছে। ...দ্রোহ পরিণত হয় বিদ্রোহে।" (পৃ. ৩৯১)

লেখক যে এ বইয়ের সিডি প্রকাশককে দেননি, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো এ বইয়ের "ভালোবাসা" প্রবন্ধটি। এ প্রবন্ধের বক্তব্য যদি লেখকের আন্তরিক বক্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে পুরো বইয়ের অনেক বানানই লেখকের নিজের বানান নয়, তা প্রকাশকের অধীনস্থ হরফকর্মীদের, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। একই সূত্রে অনেক মুদ্রণপ্রমাদকেও তাই লেখকের ঘাড়ে চাপানো যায় না। প্রকাশককেই তার জন্য দায়ী করতে হয়। "ভালোবাসা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক তাঁর যুক্তি তুলে ধরে বোঝান, কেন তিনি শব্দশেষের এবং বিশেষত ক্রিয়াপদের শেষের উচ্চারিত ও-ধ্বনিতে ও-কার ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গত তিনি পত্রিকা-সম্পাদক ও হরফকর্মীদের ব্যঙ্গ করতেও ভোলেন না, যাঁরা তাঁর লেখার ও-কারকে কেটে বাদ দিয়ে থাকেন। অতএব ধরে নিতে পারি, সৈয়দ হক তাঁর মূল লেখার মধ্যে এইসব ও-কার ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও এর প্রমাণ মেলে। কিন্তু 'কথা সামান্যই' গ্রন্থের লেখাগুলোতে লেখকের সেই নিজস্ব শৈলী খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখকের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে ক্রিয়াপদের যে বানান লেখক তাঁর পাÊুলিপিতে লিখেছিলেন, হয় তা অক্ষত রাখতে হতো, না-হয় "ভালোবাসা" লেখাটিকেই গ্রন্থটি থেকে বাদ দিতে হতো। বইয়ের বেশ কয়েকটি মারাত্মক বানান-ভুলকেও একইভাবে পর্যাপ্ত সম্পাদনার অভাব হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং সেজন্য অবশ্যই প্রকাশক দায়ী। প্রকাশকের সে দায় যে অন্য যে কোনো দায়ের থেকে মারাত্মক, তার কারণ গ্রন্থটি ঘোষিতভাবেই ভাষা-বিষয়ক।

শৈলী বিষয়ক একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। পাঠক লক্ষ করবেন, প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ কোনো শব্দ, বিশেষ কোনো বাক্যাংশ অথবা উদ্ধৃতি প্রদান করার সময়ে সেগুলোকে বাঁকা করে বা ইটালিক করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলা হরফের সঙ্গে এই শৈলী কতোটা মানানসই, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। বাংলা বর্গাকার হরফের খাড়া আর

বাঁকায় তফাত সামান্য, তাছাড়া ইংরেজির মতো বাঁকা হরফের জন্য বাংলায় আলাদা কোনো ফন্ট নেই। তাই প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একক উদ্ধরণচিহ্ন ও দ্বৈত উদ্ধরণচিহ্ন দিয়ে এগুলোকে প্রতিস্থাপিত করা হলে পৃষ্ঠা ও মুদ্রণের নান্দনিকতা বাড়তো বলেই মনে হয়।

"চেহারা" প্রবন্ধে বইয়ের ফ্ল্যাপে লেখকের ছবি ছাপা নিয়ে রসিকতা করা হয়েছে। হয়তো একই কারণে বইটিতে কোনো ফ্ল্যাপের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ছবিও ছাপা হয়নি। এর বদলে পেপারব্যাক বইয়ে যেমনটা ব্লার্বের ব্যবস্থা থাকে, শেষ প্রচ্ছদকে সেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রকাশক হয়তো লেখকের মন্তব্যের প্রতি কিছুটা বাড়তি সম্মান দেখিয়েছেন, তবে এটা না করলেও চলতো। কারণ গ্রন্থশিল্পে ফ্ল্যাপের ব্যবহার বর্তমানে এতোটা ব্যাপক ও গ্রহণযোগ্য যে, সেখানে থেকে সরে আসাটা নিজের চোখ বন্ধ করে সত্যকে অস্বীকার করার মতো।

প্রতিটি লেখার শেষে লেখক রচনাকাল ব্যবহার করেছেন। এটি একটি ভালো অভ্যাস। আরো ভালো অভ্যাস হলো রচনাকালটি বঙ্গাব্দের হিসেবে লেখা। এ ধরনের জাতীয়তাবাদী অভ্যাস থেকে লেখক-পাঠক সকলেই ক্রমে দুর থেকে দুরে সরে আসছেন। সরকারিভাবে তা খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে সংলগ্ন করার মাধ্যমে কোনোমতে টিকিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়, তার চেয়েও লেখকদের এই প্রচেষ্টা অধিক ফলপ্রসু। তবে অর্থবছর ও শিক্ষাবছর বঙ্গাব্দের হিসেবে না করা পর্যন্ত এই ফলপ্রসু প্রচেষ্টাও বিশেষ কোনো ফল দেবে, এমন মনে হয় না।

৪

সৃজনশীল যে কোনো লেখকের মুল প্রকরণ হলো শব্দ। শব্দের অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নিয়ে তাঁরা খেলা করেন; আর সেই খেলায় যাঁরা যতো পটু, তাঁদের লেখা ততো ভালো হয়ে ওঠে। 'কথা সামান্যই' গ্রন্থটি কিন্তু শব্দের সেই প্রায়োগিক দিক নিয়ে নয়, বরং স্বয়ং শব্দ নিয়ে। বিশেষ কোনো শব্দকে ধরে তার অভিধা, উৎস, প্রয়োগ, অর্থান্তর প্রভৃতির সরস আলোচনা প্রবন্ধগুলোর অন্যতম প্রধান বিবেচ্য। তবে সাধারণ মানুষের মতো লেখকের স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাও যেহেতু সঞ্চিত থাকে কোনো না কোনো শব্দের অনুষঙ্গে, সেহেতু 'কথা সামান্যই' গ্রন্থেও সৈয়দ হকের কলম দিয়ে এমন অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, যাকে নিরেট শব্দবিষয়ক আলোচনা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এভাবে আপাতদৃষ্টে গ্রন্থটিকে শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন মনে হলেও, এই গ্রন্থের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে লেখকেরই শব্দানুষঙ্গী বহুমুখী জীবন-অভিজ্ঞতা। প্রস্তাবিত সামান্য কথাও যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসামান্য হয়ে ওঠে, সম্ভবত এটাই তার মুল কারণ।

সৈয়দ শামসুল হক। *কথা সামান্যই*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৬। প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী। মুল্য: ৩৫০.০০ টাকা।
(রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ চর্চা পাঠচক্রে ১৫ই মার্চ ২০০৭ তারিখে পঠিত)

লেখকের ঠিকানা
সহকারী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ০৭২১-৭৫১২৫৭ ॥ ০১৭১৫-২৯১৩৫৭
ই-মেইল : swarochishsarker@yahoo.com